আ ন ম গোলাম মোস্তফা

KOBI PROKASHANI

অন্তরঙ্গ আলোকে
আ ন ম গোলাম মোস্তফা

প্রকাশকাল
কবি প্রকাশনী প্রথম প্রকাশ : এপ্রিল ২০২৫

প্রকাশক
সজল আহমেদ
কবি প্রকাশনী ৮৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম মার্কেট
২৫৩-২৫৪ ড. কুদরত-ই-খুদা রোড কাঁটাবন ঢাকা ১২০৫

স্বত্ব
অনির্বাণ মোস্তফা
ঊর্মি মোস্তফা

প্রচ্ছদ
সব্যসাচী হাজরা

বর্ণবিন্যাস
মোবারক হোসেন

মুদ্রণ
কবি প্রেস
৩৩/৩৪/৪ আজিমপুর রোড লালবাগ ঢাকা ১২১১

ভারতে পরিবেশক
অভিযান বুক ক্যাফে কথাপ্রকাশ ঢাকা বুকস বইবাংলা দে'জ পাবলিশিং বাতিঘর কলকাতা

মূল্য : ৩০০ টাকা

Antaranga Aloke [Face to face with the eminent litterateur] by A N M Golam Mostafa Published by Kobi Prokashani 85 Concord Emporium Market 253-254 Dr. Kudrat-e-Khuda Road Katabon Dhaka 1205
Kobi Prokashani First Edition: April 2025
Phone: 02-44617335 Cell: +88-01717217335 +88-01641863570 (bKash)
Price: 300 Taka RS: 300 US 15 $
E-mail: kobiprokashani@gmail.com Website: kobibd.com

ISBN: 978-984-95043-4-4

ঘরে বসে কবি প্রকাশনীর যেকোনো বই কিনতে ভিজিট করুন
www.kobibd.com or www.kanamachhi.com
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৬৪১-৮৬৩৫৭১
www.rokomari.com/kobipublisher
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৫১৯-৫২১৯৭১ হটলাইন ১৬২৯৭

উৎসর্গ

আমার পরলোকগত জননী
মরহুমা কামরুন্নেসার
স্মৃতির উদ্দেশে—

সূচিপত্র

ভূমিকা ৯
অবতরণিকা ১১
ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ২১
ডক্টর কাজী মোতাহার হোসেন ৩১
প্রিন্সিপাল ইব্রাহীম খাঁ ৩৮
মোহম্মদ বরকতুল্লাহ ৪৫
ডক্টর কুদরত-ই-খুদা ৫৩
ডক্টর এনামুল হক ৬১
মুহম্মদ মনসুরউদ্দিন ৬৯
কবি জসীমউদ্‌দীন ৭৭
বেগম সুফিয়া কামাল ৮৬
মুনীর চৌধুরী ৯৩
আবুল ফজল ১০২
আবদুল কাদির ১১৩

ভূমিকা

'অন্তরঙ্গ আলোকে' আমাদের জাতীয় জীবনের কয়েকজন বিশিষ্ট মনীষীর জীবনকথামূলক সাক্ষাৎকারের সংকলন। সাহিত্যিক-সাংবাদিক আ ন ম গোলাম মোস্তফা নতুন রীতিতে নেওয়া এসব সাক্ষাৎকারে সাহিত্যিকদের স্মৃতিকথার সাথে সাথে তাঁদের যুগটিকে ধরে রাখার প্রয়াস পেয়েছেন। অনিবার্যভাবে এর ওপর ছায়া ফেলেছে দেশ, কাল ও সমাজ। কিছু কিছু এমন ঘটনা এতে বিবৃত হয়েছে যেখানে এ শতাব্দীর গত কয়েক দশকের মূল্যবোধের চিত্র ছবির মতো ফুটে উঠেছে।

লেখক প্রতিটি সাক্ষাৎকারকে একটি নিটোল গল্পের রূপ দেওয়ায় গ্রন্থখানি তথ্যমূলক স্মৃতিকথা হয়েও ভিন্ন স্বাদ দেবে বলে আমার ধারণা। সাথে সাথে আলোচ্য লেখকদের রচনারীতি, শিল্পী-মানস ও সাহিত্য সাধনার একটি সংক্ষিপ্ত অথচ স্পষ্ট পরিচয় এ গ্রন্থে বিধৃত।

লেখক অন্তরঙ্গ আলোকে যাঁদের দেখেছেন তাঁদের অন্তর্জীবন ও বহির্জগতের নিখাদ বিবরণ সাংবাদিকসুলভ ভঙ্গিতে বলেছেন। সমাজ, রাষ্ট্র, সাহিত্য, সংস্কৃতি সম্পর্কে তাঁরা কী ভাবেন, অতি সযত্নে তিনি তা বের করে নিয়েছেন।

এ গ্রন্থের অনেক বক্তব্যের সাথে অনেকের দ্বিমত থাকা বিচিত্র নয়; কিন্তু আমি এ কথা বিশ্বাস করি যে, ইতিহাসবেত্তা ও সিরিয়াস পাঠক যুগ-মানস বিচার ও গবেষণায় এ গ্রন্থ থেকে প্রচুর সাহায্য পাবেন এবং আমরা কোথায় আছি সাধারণ পাঠকদের কাছে এ উপলব্ধিও স্পষ্ট হবে।

ড. হাসান জামান

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

অবতরণিকা

এক : পূর্বকথা

তেরো শতক থেকে মুসলমানরা বাংলাদেশের অধিবাসী। আর উনিশ শতকে এসে বাংলার জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ ছিল মুসলমান।[১] কিন্তু মধ্য যুগে বাংলা সাহিত্য হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের অবদানে সমৃদ্ধ হলেও আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে বাংলার মুসলমানেরা বিস্ময়করভাবে অনুপস্থিত। বিশেষ করে আধুনিক বাংলা সাহিত্য যখন উত্তরণের সিঁড়ি বেয়ে পরিণতির দিকে এগিয়ে চলেছে, তখন বাঙালি মুসলমানেরা সাহিত্য সাধনায় একেবারে উদাসীন। কারণ তৎকালীন সামাজিক পরিবেশ।

উনিশ শতকে ইংরেজ রাজত্বের শুরুতে মুসলমানেরা পাশ্চাত্য বিদ্যা অর্জন করতে সক্ষম হননি। এর কারণ তাঁদের অর্থনৈতিক দুর্গতি ও সামাজিক নিম্নমান। বাংলার মুসলমানদের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ ছিলেন এ দেশীয় নিম্নবর্ণের অমুসলমানদের উত্তর পুরুষ।[২] যে মুষ্টিমেয় মুসলমান বহিরাগত ছিলেন, নবগঠিত মুসলমান সমাজে তাঁদেরই প্রাধান্য ছিল। কেবল উচ্চশ্রেণির হিন্দুরাই মুসলমানদের নিম্নশ্রেণির হিন্দুর সমান জ্ঞান করতেন না, বিদেশাগত মুসলমান আশরাফ ও শরিফজাদারাও এ দেশের মুসলমানদের আতরাফ ও আজলাফজাদ জ্ঞান করতেন। সামাজিক শ্রেণিবিন্যাসে তাই সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানরা ছিলেন সাধারণ কৃষক ও শ্রমজীবী। ইংরেজ রাজত্বে প্রজাদের যে দুর্দশা—তা ঘটনাক্রমে সাধারণভাবে এই কৃষক ও শ্রমজীবীদের দুর্দশা। ফলে এদের পক্ষে ইংরেজি বা আধুনিক শিক্ষা গ্রহণের প্রধান অন্তরায় ছিল আর্থিক সংগতির অভাব। যে অল্পসংখ্যক মুসলমান উচ্চবিত্ত এই শিক্ষা গ্রহণ করতে পারতেন তাঁরা তখন নবাবের রাজনৈতিক ক্ষমতা ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা সংকোচের ফলে নিজেরাও রীতিমতো পর্যুদস্ত। তাই ধর্মীয় গোঁড়ামি বা আত্মাভিমান কিংবা ইংরেজ-বৈরিতা মুসলমানদের আধুনিক শিক্ষা গ্রহণ না করার প্রধান কারণ নয়। তাহলে আর্থিক সংগতিসম্পন্ন যুক্ত প্রদেশের মুসলমানেরা এদিকে অগ্রসর হতে পারতেন না।[৩]

---

[১] R. C. MAJUMDER (History of freedom movement in India).

[২] Bengali: Encyclopaedia of Islam.

[৩] মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য—ড. আনিসুজ্জামান।

ইংরেজ শাসনামলে বাংলাদেশের সমাজব্যবস্থায় কতকগুলো স্পষ্ট-লক্ষ মৌলিক পরিবর্তন সূচিত হয়। এর আগে বাংলার সমাজ ছিল গ্রামকেন্দ্রিক আর অর্থনৈতিক কাঠামোর মূল ভিত্তি ছিল আবাদি জমি। কিন্তু এ সময় থেকে জীবনযাত্রা হয়ে ওঠে শহরমুখী এবং অর্থনৈতিক জীবনের মূল মাপকাঠি রূপান্তরিত হয় মুদ্রায়।[৪] সমাজব্যবস্থার এই মৌলিক পালাবদলের সঙ্গে সঙ্গে নতুন সামাজিক শ্রেণিবিন্যাস দেখা যায়। ভূমিস্বত্বভোগী জমিদার আর রায়ত শ্রেণির মাঝখানে জন্ম নেয় মধ্যবিত্ত সমাজ। কিন্তু নতুন মধ্যবিত্ত সমাজে মুসলমানরা প্রাধান্য পায় না। কারণ মুসলমানদের পুনর্গঠিত হওয়ার জন্য তখন যা সবচেয়ে বেশি প্রয়োজনীয় ছিল সেই নগদ অর্থ বা মুদ্রা মুসলমানদের হাতে সঞ্চিত হতে পারেনি। তাই নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণিতে হিন্দুরাই প্রাধান্য লাভ করে। এঁরাই আর্থিক সংগতির কারণে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে ওঠেন এবং নতুন সমাজ, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের নেতৃত্ব নেন। ঐতিহাসিক শক্তি ও ঘটনার পারম্পর্যে মুসলমান সম্প্রদায় এইভাবে পিছিয়ে পড়লেন।

কিন্তু মুসলমানদের জীবনীশক্তির পরিচয় রয়েছে সে সময়কার ধর্মসংস্কার আন্দোলনের মধ্যে। তরিকা-ই-মুহম্মদীয়, ফারায়েজী আন্দোলন এবং তিতুমিরের সংগ্রাম মূলত ধর্মীয় আন্দোলন এবং এগুলোর মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল প্রাচীনতর উচ্চ জীবনযাত্রার দিকে আকর্ষণ; কিন্তু 'সমাজের নতুন বিন্যাস, মানসিক সম্পর্কের পুনর্নির্ধারণ, অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ'[৫] এই আন্দোলনগুলোতে সুস্পষ্ট এবং এ আন্দোলনগুলো পরবর্তীকালে পর্যায়ক্রমে ইংরেজ শাসনবিরোধী আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়।

১৮৭০-এর পর ইংরেজি শিক্ষানীতি রদবদলের ফলে শিক্ষা যখন কিছুটা সুলভ ও সহজলভ্য হয়ে ওঠে তখনই মুসলমানরা শিক্ষালাভের দিকে ঝুঁকে পড়েন। এখন থেকেই ইংরেজ শাসনের সঙ্গে মুসলমানদের সন্ধি স্থাপনের চেষ্টা শুরু হয় এবং মুসলমান সমাজে এক নব জাগরণ সৃষ্টি হয়। এই নব আন্দোলনের অবিসংবাদিত নেতা উত্তর ভারতের স্যার সৈয়দ আহাম্মদ এবং বাংলাদেশের নবাব আবদুল লতিফ। তবে তাঁদের দুজনের চিন্তাধারার মধ্যে স্বাতন্ত্র্য ছিল। এই পার্থক্যের প্রভাব বাংলাদেশ এবং উত্তর প্রদেশের মুসমানদের শিক্ষা, চিন্তা এবং পরবর্তী সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অগ্রগতির ক্ষেত্রে স্পষ্টভাবে চিহ্নিত হয়েছিল।[৬] স্যার সৈয়দ আহাম্মদ চেয়েছিলেন ইংরেজি শিক্ষা সরাসরিভাবে আর নবাব চেয়েছিলেন মাদরাসা শিক্ষা। নবাব সাহেব আর একটি বিষয়ে উদ্যোগী ছিলেন। তিনিই প্রথম বাঙালি মুসলমানদের বাংলাকে উচ্চ মধ্যবিত্ত মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত অসংখ্য আরবি,

[৪] ভারতীয় সমাজ পদ্ধতি—ড. ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত।

[৫] মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য—ড. আনিসুজ্জামান।

[৬] সাংস্কৃতিক সংকট—বদরুদ্দিন ওমর।

ফারসি, উর্দু মিশিয়ে পরিশুদ্ধ করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল 'আধা মুসলমান নিম্নশ্রেণির লোকদেরকে আরও কিছুসংখ্যক আরবি-ফারসি-উর্দু শব্দ শিখিয়ে তাদের মধ্যে কিছুটা সত্যিকার ধর্মভাব জাগ্রত করা, তাদেরকে সত্যিকার মুসলমান হওয়ার পথ নির্দেশ করা।'[৭]

তবে শিক্ষালাভের সঙ্গে সঙ্গে বাঙালি মুসলমানরাও নব উৎসাহে আধুনিক যুগের সাথে সন্ধি স্থাপন করেছিলেন। হিন্দু সমাজের চেয়ে একটু পরবর্তী সময় হলেও একই পথ ধরে সামাজিক অগ্রগতি ও ভবিষ্যৎ গঠনের চেষ্টায় তাঁরাও আত্মনিয়োগ করেছিলেন। ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দের দিকে বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে আধুনিক জীবন সম্পর্কে সচেতনতা দেখা দেয় এবং এই সময় তাঁরা আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে আত্মনিয়োগ করেন; কিন্তু সে সময় ছিল আধুনিক বাংলা সাহিত্যে স্বর্ণযুগ। বাংলা সাহিত্য তখন প্রতিভাধর হিন্দু সাহিত্যিকদের সৃষ্টির উদ্ভাসে সমৃদ্ধ। সেই ক্রান্তিকালে যে কয়েকজন বাঙালি মুসলমান সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে আত্মনিয়োগ করেন, তাঁদের অগ্রগামী হিন্দু লেখকদের অনুকরণ-অনুসরণ করা ছাড়া অন্য কোনো পথ ছিল না। তাঁদের মধ্যে তেমন প্রতিভাধর সাহিত্যিক জন্মগ্রহণ করেননি। কারণ মুসলমান লেখকরা যখন আধুনিক সাহিত্য ক্ষেত্রে আত্মনিয়োগ করেছেন, তখন হিন্দু লেখকরা প্রস্তুতিপর্ব শেষ করে সিদ্ধিলাভ করতে যাচ্ছেন। বাঙালি মুসলমানদের প্রথম আধুনিক ফসল মীর মশাররফ হোসেনের 'বসন্ত কুমারী' নাটক যখন প্রকাশিত হয় (১৮৭৩) তখন বঙ্কিম প্রতিষ্ঠিত; হেম নবীন বিহারী লাল তাঁদের পরিপূর্ণ সম্ভাবনা নিয়ে বিকাশ-উন্মুখ। মধু ও দীনবন্ধুর প্রতিভার কেবল তিরোভাব ঘটেছে। তাই মৌলিক প্রতিভার দিক থেকে নজরুলের আগে বাঙালি মুসলমান লেখকরা কেউ অতটা অগ্রসর হননি, যার ফলে একটা নতুন দিগন্ত উন্মোচন করতে তাঁরা সক্ষম হতেন। 'এর ফলে দাঁড়িয়েছে এই যে, ঊনবিংশ শতাব্দী বলতে এক পুথি এবং মীর মশাররফ হোসেন ও কায়কোবাদের গুটিকতক রচনা ছাড়া বাঙালি মুসলমানের পক্ষে তেমন উল্লেখযোগ্য কোনো সাহিত্য সৃষ্টি সম্ভব হয়নি।'[৮] অবশ্য মোজাম্মেল হক, রেয়াজ-অল-দীন আহমদ মজাহাদীর, লুৎফর রহমান ও সৈয়দ এমদাদ আলীর রচনাবলি বাংলা সাহিত্যের সম্পদরূপে বিবেচিত।

এই সময় আর যাঁরা সাহিত্য সাধনা করেছেন তাঁদের মধ্যে শেখ আবদুর রহিম, দাদ আলী, আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ, মৌলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী, সৈয়দ ইসমাইল হোসেন শিরাজী, মোহাম্মদ এয়াকুব আলী চৌধুরী, মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী, এস. ওয়াজেদ আলী, নজিবর রহমান, শেখ ফজলুল করিম, কাজী এমদাদুল হক, বেগম রোকেয়া শাখাওয়াত হোসেন ও কবি গোলাম মোস্তফার নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।[৯]

---

[৭] ঐ।

[৮] বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত—মুহাম্মদ আবদুল হাই।

[৯] মুসলিম বাঙলা সাহিত্য—ড. এনামুল হক।

এঁরা সবাই উনিশ শতকের শেষ থেকে শুরু করে বিশ শতকের প্রথম কয়েক দশক পর্যন্ত সাহিত্য সাধনা করেছেন। যাঁদের সম্পর্কে আমি আলোচনা করেছি তাঁরাও মোটামুটিভাবে এ যুগেরই মানস-সন্তান।

দুই : প্রসঙ্গ কথা

নিদারুণভাবে অভিভাবকহীন আমাদের এই সমকাল। পূর্ববাংলার সমাজ ও সংস্কৃতি এখন এমন একটি যুগকে আকীর্ণ করে লতিয়ে উঠেছে যখন জ্ঞানের ব্যভিচার, বুদ্ধির আলস্য, আর চিন্তার নিস্পৃহতা যুগের মেরুদণ্ডকে নিষ্ক্রিয় ও নিঃশেষ করতে উদ্যত।

একজন আধুনিক সমালোচক বলেছেন—'আমরা যে যুগের অধিবাসী হওয়ার দূরাদৃষ্ট লাভ করেছি রুচির বিচারে সে যুগ আধুনিক বাংলাদেশের সবচেয়ে দুশ্চরিত্র সন্তান। বাঙালি সংস্কৃতির এ এমন একটা যুগ যখন কাল অভাবিত দুর্ঘটনায় আত্মহীন, শরীর ব্যভিচারী বোধ অশিক্ষিত ও রুচি গর্হিত। গত একশ বছর সাহিত্য ক্ষেত্রে অতিবর্ষণের পর অনিবার্য শীত নিষ্ফলা অধিকার নিয়েছে এ ক্ষেত্রের। এই যুগে মহাকবির বংশধরেরা মৌন, খ্যাতি ফলজীবী, কবিকল্পনা উদ্ভাবনহীন এবং একটানা রোদ্দুরের দুঃশীল তাপে শতাব্দীব্যাপী প্রেরণা অবসিত। এ যুগে গ্রন্থ সংখ্যা বেড়েছে অবিশ্বাস্য হারে, পাঠক সংখ্যা আমাদের পূর্বসূরি অগ্রজদের দুশ্চরিত্র ঈর্ষার বিষয়। তবু শুকিয়ে গেছে সেই মজ্জা—সেই কান্তিমান আলো—যাকে আমরা নাম দিই স্বাস্থ্যবান প্রেরণা।'[১০] সমালোচকের অত্যুক্তি পুরোপুরি স্বীকার না করেও বলা যায় আমাদের সামনে কোনো সর্বজনীন স্তম্ভ নেই—নেই এমন কোনো প্রতিভা, যাকে নিঃসংশয়ে 'গ্রেট' বলা যেতে পারে। এই সংকটাপন্ন পরিস্থিতিতে যে নগণ্য সংখ্যক ব্যক্তিত্বের সুশীল জ্ঞান এবং মেধাবী উপলব্ধি ফলবান মর্যাদা পেয়েছে—এমন কয়েকজনের আমি সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছি। বিশ শতকের গোড়া থেকে স্বাধীনতার উত্তরকাল পর্যন্ত যে সময়ের ব্যবধান—এরই মধ্যে লালিত হয়েছেন এঁরা। তাঁদের জীবনকথার ফাঁকে ফাঁকে তাঁদের দৃষ্টিতে সেই যুগটাকে আমি ধরতে চেয়েছি—এই গ্রন্থখানিতে। কারণ, আমার কাছে মনে হয়েছে, উত্তর পুরুষের কাছে যুগ, সমাজ, জীবন ও শ্রেয়স (values) সম্পর্কে বলার লোক এঁরাই। এঁদের হারানোর আগে—আমাদের অতীতের উপাত্ত (datta) এঁদের কাছ থেকেই সংগ্রহ করে রাখতে হবে। এরা প্রত্যেকেই মহান ব্যক্তিত্ব—সাহিত্যের ক্ষেত্রেও এমন দাবি আমি করছি না। কারণ শুধু আমাদের দেশে নয়, সাহিত্য ও শিল্পে আজকাল শ্রেষ্ঠ প্রতিভা বিরল। যুগের পার্থক্যে গুণেরও তারতম্য হয়, শিল্পমূল্যের শ্রেষ্ঠত্ব অনুসারে বিগত যুগের দ্বিতীয় শ্রেণি আজকের প্রথম বলে গণ্য হতে পারে। আমাদের যুগ

---

[১০] বাঙলা সমালোচনা প্রসঙ্গে—আবদুল্লাহ আবু সাঈদ।

হলো ‘গ্রেট মাইনরে’র অর্থাৎ খণ্ড প্রতিভার যুগ। সমসাময়িক প্রথম শ্রেণির কোন কবি রবীন্দ্রনাথের সমতুল্য গণ্য হবেন, অথবা কোন কথাশিল্পী গলসওয়ার্দি বা টমাস মানের? আনাতোল ফ্রাঁন্স, ইয়েটস, রবীন্দ্রনাথ, বার্নার্ড শ’, গলসওয়ার্দি, হামসুন, বোয়ের, এমনকি কিপলিং পর্যন্ত আমাদের পরিচিত হয়েছিলেন অনায়াসে, নোবেল পুরস্কারের পাঞ্জা পাওয়ার অনেক পূর্বে। বিগত কালে যাঁরা শ্রেষ্ঠত্বের সম্মান পেয়েছেন, তাঁদের সাথে সমসাময়িক কালের শ্রেষ্ঠদের মধ্যে পার্থক্য এইখানে। এটি প্রতিভার মৌলিক পার্থক্যও বটে।[১১]

গ্রন্থের সাক্ষাৎকারগুলো গ্রহণ করেছি ১৯৬৭ সাল। আজ সাড়ে তিন বছর পর, সেগুলো প্রকাশ করার সময় ইচ্ছা করেই রচনার গায়ে কালের আঁচড় না লাগিয়ে সেগুলোকে অক্ষত অবস্থায় রেখেছি। কারণ প্রতিটি রচনার একটা তাৎক্ষণিক আবহগত আবেদন আছে আমার কাছে, কিন্তু এই তিন অথবা সাড়ে তিন বছর পূর্ববাংলার ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য সময়—যার বিবরণ অপরিহার্য।

যখন সাক্ষাৎকার গ্রহণ করি তখন দেশে একনায়ক শাসিত স্বৈরাচারী শাসনব্যবস্থা। সমাজজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে—এমনকি শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতিতেও একটি শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতি। সেই দুঃসহ জীবন যাপন থেকে মুক্তির জন্য এ দেশের আপামর জনসাধারণ ঊনসত্তরের আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। সমগ্র দেশ এক শক্তিতে পরিণত হয়ে দুর্বার গণসংগ্রাম গড়ে তোলে—কাঁপন লাগে স্বৈরাচারীর প্রাসাদে। তাসের ঘরের মতো ভেঙে খানখান হয়ে যায় একনায়কের শোষণযন্ত্র। আলোর পথযাত্রীরা মুক্তিপথের ইঙ্গিত পায়।

এই গণজাগরণে, যা সমগ্র দেশের মর্মমূলে নাড়া দিয়েছে, গ্রন্থে আলোচিত মনীষীদেরও ভূমিকা ছিল। প্রত্যেকে কিছু না কিছু ভূমিকা সেখানে পালন করেছেন। বিশেষ করে বেগম সুফিয়া কামাল, ডক্টর কুদরত-ই-খুদা, জনাব আবুল ফজল ও কবি জসীমউদ্‌দীনের অবদান এখানে অবশ্যই স্মর্তব্য।

এ প্রসঙ্গে দু-একটি ঘটনা উল্লেখ করলেই আন্দোলনের চরিত্র, বিস্ফোরণ-উন্মুখ চেতনায় সাহিত্যিক শিল্পীদের ভূমিকা এবং তৎকালীন শাসনযন্ত্রের আচার-ব্যবহারের কিছুটা পরিচয় মিলবে। আলোচ্য মনীষীদের মানস হৃদয়ঙ্গম করার জন্যও এর প্রয়োজন আছে। সম্প্রতি জনাব আবুল ফজল সবার জানা এ ঘটনাগুলো তাঁর ‘জার্নাল’ ধরনের গ্রন্থ ‘লেখকের রোজনামচায়’ প্রকাশ করেছেন। আমি সেখান থেকেই উদ্ধৃতি দিচ্ছি :

‘প্রেসিডেন্ট তখন ঢাকায় সরেজমিনে হাজির, তবুও সেদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চলছে ত্রাসের রাজত্ব। সর্বত্র একটা আতঙ্ক আর ত্রাহি-ত্রাহি রব। ছাত্র-অধ্যাপক কেউই বোধ করছে না নিরাপদ। কংস প্রাসাদের সমর্থন ও ইঙ্গিতে একদল ছাত্র

---

[১১] ফ্রাঁসোয়া মারিয়াক—সরোজ আচার্য।

অধ্যাপকদের ওপরও মারমুখো আর পুলিশ হয়ে আছে নিষ্ক্রিয় দর্শক। তখন শুভ বুদ্ধিসম্পন্ন নাগরিকরা প্রতিকারের আশায় প্রেসিডেন্টের কাছে এক ডেপুটেশন পাঠান। ডেপুটেশন প্রেসিডেন্ট হাউসে গিয়ে দেখেন, প্রেসিডেন্টের পাশে বসে রয়েছেন স্বয়ং প্রদেশের কংস মহারাজ। বিচারকের পাশে আসামির আসন ইতিপূর্বে আর কখনো দেখা যায়নি।

ডেপুটেশন বুঝতে পারলেন, এ অবস্থায় সুবিচারের আশা আকাশকুসুম।

এ ঘটনার কিছুদিন আগেই মাত্র তাসখন্দ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। ঘটেছে পাক-ভারত সংঘর্ষের অবসান। দুই দেশেই নেমে এসেছে শান্তি। সাবেক প্রেসিডেন্টকে সে কথাটি স্মরণ করিয়ে দিয়ে সুফিয়া কামাল বললেন, 'আপনি তাসখন্দ চুক্তি করে অত বড় পাক-ভারত যুদ্ধ থামিয়ে দিতে পারলেন, সে তুলনায় এ বিশ্ববিদ্যালয়ের গণ্ডগোল তো সামান্য ব্যাপার। এ পারবেন না, এ কি হয়?'

মুহূর্তে রাষ্ট্রপ্রধানের ক্রুদ্ধ কণ্ঠ গর্জে উঠল : ওঁহা ত আদমি হে। ইঁহা ত ছব হেওয়ান হে।

ছোট হোক বড় হোক সুফিয়া কামাল তো কবি। কবিরা চিরকালই সত্য ও নির্ভীকতার প্রতীক। এসব খড়ের বাঘদের দপ করে জ্বলে ওঠায় তিনি ভয় পাবেন কেন?

সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর দিলেন, তব আপ হেওয়ানকে প্রেসিডেন্ট হে...।

শুনে তপ্ত লোহার মতো লাল হয়ে উঠলেন সে দিনের 'লৌহমানব'। এক ক্ষুদ্রকায় মহিলা যে তাঁর মুখের ওপর এমন জবাব দিতে পারেন এ যেন তাঁর কল্পনার বাইরে। রাগে-বিস্ময়ে কোনো রা-ই যেন করতে পারলেন না তিনি অনেকক্ষণ ধরে।

ডেপুটেশন ফিরে এলেন মর্মাহত চিত্তে। দেশের রাষ্ট্রপ্রধান দেশের বৃহত্তম শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভালো-মন্দ বুঝতে চান না এর চেয়ে দুর্ভাগ্য দেশের জন্য আর কী হতে পারে।

কবির কথাটার ইঙ্গিত মুখ ফুটে কেউ না বললেও বুঝতে বেগ পেতে হলো না কারও। হেওয়ানের প্রেসিডেন্ট হেওয়ানই তো হয়ে থাকে। যেমন সিংহকে বলা হয় পশুর রাজা।

হ্যাঁ, যে কবিরা হক কথা বলতে কখনো ভয় পান না, সুফিয়া কামাল সে জাতীয় কবি। তাঁকে নিয়ে আমাদের গৌরব এ কারণেই। পাশাপাশি বসা দুই 'লৌহমানব'ও কবির কথার ইঙ্গিত যে বুঝতে পারেননি তা নয়, পেরেছেন বলেই হুংকার দেওয়ার সাহসটুকুও খুঁজে পাননি সে মুহূর্তে তাঁরা। হক কথা এমনই মর্মভেদী?'

কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যানের পদ খালি হলে তা পূরণের জন্য উপযুক্ত লোক খুঁজে পাওয়া রীতিমতো সমস্যা হয়ে দাঁড়াল, শেষে অনেক বলে